'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ' : কিছু আলোচনা

রাকেশ জানা

রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ পর্বে এসে দু'বছরের ব্যবধানে তিনটি ক্ষুদ্র উপন্যাস রচনা করলেন 'দুইবোন' (১৯৩৩), 'মালঞ্চ' (১৯৩৪), 'চারঅধ্যায়' (১৯৩৪)। প্রথম দুটি উপন্যাসের আয়তন 'নষ্টনীড়' ছোটগল্পের থেকেও ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র উপনাসের ক্ষেত্রে সুরগত ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায় যাতে অনাবশ্যক অংশ নির্মমভাবে বর্জন করতে হয়। বাস্তবতার প্রয়োজনে অনাবশ্যক অংশ যুক্ত করা হলে তা উপনাসিকের ত্রুটি বলেই বিবেচিত হয়। রবীন্দ্র জীবনে বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকের সময়কাল পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় এই সময় তাঁর বড় কিছু লেখার দিকে ঝোঁক নেই। ১৯৩০-১৯৩১ সালের মধ্যে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেছেন। এই সময় তাঁর মন ছবি আঁকার দিকেই বেশি ঝুঁকেছিল। ড. বিশ্বজীবন মজুমদারের মতে 'চিত্রকলার মতোই এই সময় তাঁর রচনা স্বল্পাবয়ব ফ্রেমে বাঁধা পড়ল এবং ইঙ্গিতধর্মী হয়ে উঠল"[১]।

রবীন্দ্র উপন্যাসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা উপন্যাসে কালান্তর' গ্রন্থে বলেছেন 'চতুর্দিগবর্তী মনুষ্যসমাজ তার সমগ্র উত্তাপ প্রয়োগ করে আমাদের প্রত্যেককে প্রতিক্ষণে ফুটিয়ে তুলছে' -এ বিশ্বাসকে রবীন্দ্রনাথ শিল্পীর দৃষ্টিতে পরীক্ষা করেছেন তাঁর উপন্যাসে। 'মানুষের লক্ষ লক্ষ সম্পর্কসূত্র আছে -যার দ্বারা প্রতিনিয়ত আমরা শিকড়ের মত বিচিত্র রসাকর্ষণ করছি'-তাকে বিশ্লেষণ করা, এক কথায় সে সম্বন্ধে সচেতন থাকা সাহিত্যের কাজ বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। সুতরাং সমাজ ও সভ্যতার গোটা চেহারাকে এবং গূঢ়ার্থকে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ধরতে চেয়েছেন এটা স্বাভাবিক"[২]। আসলে রবীন্দ্র উপন্যাসে 'ঘটনার অর্থ এখানে এই : ব্যক্তি যে জীবন বিন্যাসের অন্তর্বর্তী সেই জীবন-বিন্যাসে অপর একটা ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষে সুগভীর একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ঘটনা এবং নাটক দুই-ই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এই পথে প্রবেশ করে থাকে"[৩]। আমাদের আলোচ্য দুই উপন্যাস 'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ' এক বছর আগে পরের ব্যবধানে রচিত। উচ্চ মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের পরিবর্তিত অভ্যন্তরীণ রূপটি এই দুই উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে। বাঙালির সাংসারিক জীবনে নারীর ভূমিকা প্রধান হয়ে উঠেছে এখানে তার প্রকাশ রয়েছে।

'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ' এ সংসারে স্ত্রীদের একছত্র প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেছে। এখানে পরিণত পুরুষ ও নারীর জীবনে প্রেম সম্পর্কিত জটিলতাই মুখ্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথ বাস্তি জীবনের জটিল সমস্যার উপস্থাপন ঘটিয়েছেন সরাসরি। এর পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলিতে হৃদয় সম্পর্কের জটিলতাকে এতটা নিরাবরণ ভাবে প্রকাশিত হতে দেখেনি। শেষের কবিতা উপন্যাসে গৃহিনী ও প্রণয়িনীর সামঞ্জস্য তত্ত্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এই উপন্যাস দুটিতেও সেই তত্ত্বই প্রাধান্য পেয়েছে। ১৯২৫ সালে পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' প্রবন্ধ, এর ঠিক তিন বছর পর ১৯২৮ সালে লিখলেন 'নারীর মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ। আসলে এই সময় তিনি নারী ও পুরুষের সম্পর্ককে খতিয়ে নিচ্ছিলেন।

সমরেশ মজুমদার তাঁর 'বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর' গ্রন্থে এই তত্ত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন–'কবি জানেন কোমল সেবার শীতল স্পর্শ জীবনকে সঞ্জীবিত করে, কর্মে প্রেরণা দান করে, কিন্তু সে প্রেরণা দুর্বার হতে দেয় না, অসীম বন্ধনাবদ্ধ যে জীবন উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল পথে কৃতী মানুষকে টানে, মাতৃক্রোড়ের মধ্যে চিরশিশু করে না রেখে 'গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া' করার তাগিদ ও জীবনে আসে প্রিয়া—জাতীয়েরা তাঁদেরই লক্ষ্য। 'দুইবোনে' ঊর্মি সংশয়ের দুয়ারটুকু পীর হতে সাহায্য করেছে, সরলা মালঞ্চে অনুরূপ প্রয়োজনেই এসেছে। দুই উপন্যাসের কাহিনীর শুরুতে দুটি সাজানো বাগান দেখি, একটি দশ বছরের অবিমিশ্র সুখে কাটানো মালঞ্চ, সখীদের ঈর্ষায় উত্তপ্ত, আদিত্যের বন্ধুদের ভাষায় 'লাকিডগে' পরিণত-অন্যটি একটি সুরভিত মালঞ্চ বেদনা মধুর করুণ রাগে ধৌত। দুটি বাগানই শুকিয়ে আসছে তৃতীয় একজনের আগমনে। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের উপন্যাসে বহু স্থলে দু'-এর জন্যে ছোট আসনটুকু আছে, তৃতীয়জন অবাঞ্ছিত 'শেষের কবিতা'য় শোভনলাল কেতকী; 'দুইবোন' নীরদ, মালঞ্চে 'সরলা'[৪]। যদিও আলোচ্য উপন্যাস দুটির পূর্ববর্তী উপন্যাস দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির আগমনে জটিলতার সৃষ্টি আমরা আগেও দেখেছি। যেমন 'চোখের বালি'তে মহেন্দ্র আশার দাম্পত্যে বিনোদিনীর আবির্ভাব। আবার 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে দাম্পত্যে ভিন্ন পুরুষের আগমনে সংসারে ঝড় তুলেছিল। যদিও 'চোখের বালি'-তে বিনোদিনী ছিল যুবতী বাল-বিধবা। 'বিধবা হলে ক্ষুধিত-হৃদয়া হবে বিশেষ যদি যুবতী হয় এ হল বাংলা নভেলের ত্রিকালগত ধারণা। রোহিনী থেকে সে ধারণা চলে আসছে[৫]। সেই অর্থে আলোচ্য দুই উপন্যাসে সরলা ও ঊর্মিমালা তৃতীয় ব্যক্তি হলেও বাল-বিধবা নয়, তবে প্রাপ্তবয়স্কা যুবতী। যা পরকীয়া প্রেম সম্ভাবনার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত।

আসলে 'প্রেম, রিরংসা, স্নেহ ভালোবাসা কোনো কিছুকে রবীন্দ্রনাথ কেবল স্বাধীনা প্রবৃত্তি বলে ব্যাখ্যা করে ছেড়ে দেননি। বা, এদের আকস্মিকতার কোনো সুযোগ তিনি উপন্যাসে গ্রহণ করেননি। সমস্ত প্রবৃত্তিকে তিনি সমগ্র ব্যক্তিত্বের পটে রেখে পরীক্ষা করার পক্ষপাতী ছিলেন[৬]। চরিত্রে কখনো কখনো দ্বিমুখী চিত্তবৃত্তির টানাপড়েনে মানব মনের সংকট তৈরি হয় ফলে তার ভিত্তিতেই বিশ্লেষণধর্মী উপন্যাস গড়ে ওঠে। ফলে

জটিল হয়ে ওঠে মনের ভিতর মহল। চরিত্রেরা কখনো কখনো কাজের মধ্যেই মনের ভিতরে পাকানো জট খুলতে চেষ্টা করেছে। এই আত্মসমীক্ষা বা আত্মবিশ্লেষণে যখন সূত্রগুলি ছাড়িয়ে সমাধান বের করে এনেছে ঠিক তখনই আবার বিপরীত ঘটনা স্রোতে সূত্রগুলি আবার জড়িয়েছে, পরস্পরকে ছিন্ন করেছে। মানুষের জটপাকানো মন এবং জীবনের কার্যকলাপের সম্পর্ক যে কত বাঁকা অথবা দুর্নিরীক্ষ্য তার পরিচয় মেলে। আসল কথা হল আমাদের পরিচিত আপাত চেহারার পর্দাটা ছিঁড়ে ভিতরের অজানা জগত যখন প্রত্যক্ষ হয় তখন অনেক রং ঝরে যায়, রূপের পিছন থেকে কুরূপ বেরিয়ে পড়ে। আবার অনেক সময় কালের পিছন থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে কিছু সুগন্ধ। তাই বিশ্লেষণ শুধু আড়ালের উল্টো পিঠের সত্যকেই দেখায় না, শুধু নির্মম কঠিনকে আবিষ্কার করে না বাইরে ও ভিতরের অসম মিশ্রণকে জীবনের সত্য বলে চিনে নিতে চায়। আবার যে সব মানুষ মন প্রধান নয় অর্থাৎ আত্মসমীক্ষা যাদের স্বভাব সংগত নয়, যারা সহজবুদ্ধির সাহায্যে কর্মের উত্তাল তরঙ্গে ভেসে ডুবে চলেছে তারাও উপন্যাসে স্বল্পকালের জন্য এসে মনোবিশ্লেষণের আলোয় ঝিকিয়ে উঠেছে।

বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে বাংলাদেশে শহরকেন্দ্রিক সমাজজীবন-এ সামাজিক গতিশীলতা (social mobility) তীব্র আকার ধারণ করে। আগে যেখানে মোক্তার-ব্যারিষ্টারদের জীবিকাকে বেশি সম্মানীয় ধরা হত বর্তমানে তার জায়গায় শিবপুর, রুরকি থেকে পাশ করা ইঞ্জিনিয়াররা এসেছে। এসেছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা ডাক্তারের দল যাঁরা কিনা ব্যারিস্টারদের মত একই সামাজিক স্ট্যাটাসে সম্মানিত হচ্ছেন। এই ডাক্তারেরা আবার বিদেশ থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষায় কৃতবিদ্য হয়ে ফিরছেন। মূল কথা তখন বাঙালি যুবসমাজে নতুন করে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উত্তর বাঙালি আর গৃহকোণে আবদ্ধ নয়, তারা প্রতিষ্ঠা অর্জনে সচেষ্ট। এই অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থান আলোচ্য উপন্যাস দুটিতে পূর্ণ মাত্রায় লক্ষ্য করা গেছে। এই সময় থেকে রবীন্দ্র উপন্যাসে নায়কেরা আর প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায় ভুক্ত নন। এই সময়ে উপন্যাসে উঠে এসেছে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিধারী পুরুষ। দুইবোনে শশাঙ্ক শিবপুরের পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার, প্রথমে সে চাকুরিজীবী পরবর্তীক্ষেত্রে কনট্রাক্টর। ঊর্মিমালার সঙ্গে যার বিয়ে ঠিক হয়েছিল সেই নীরদ মুখুজ্যে ডাক্তার। আর মালঞ্চে 'আদিত্য শুধু নার্সারির মালিক নয় উদ্ভিদ বিদ্যায় পারদর্শী'[৭]।

বাঙালি যুবকদের মতো মেয়েরাও আজ পিছিয়ে নেই। তারাও আজ সামাজিক প্রাচীন বাধাকে অতিক্রম করার সাহস দেখিয়েছে। নিজের ভাগ্য জয় করার অসীম সাহসে তারা আজ অগ্রবর্তী। দুইবোন ও মালঞ্চে রবীন্দ্রনাথ যে নারী চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেছেন তারা উঠে এসেছে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজ জীবন থেকে। শুধু বিত্তে নয়, চিত্তে এবং শিক্ষাতেও এরা উঁচু। 'দশ বছরের বিবাহিত জীবনে নীরজা শুধু আদিত্যের নর্ম সহচরী নয়, কর্ম সহচরীও। আর ট্রেনের রিজার্ভেশন ও শশাঙ্কর রেজিগনেশনের

ব্যাপারে শর্মিলার যে ভূমিকা দেখেছি, কে বলবে সে কলকাতা শহরের এই শতাব্দীর উত্তর তিরিশের মেয়ে নয়[৯]। আর শর্মিলার বোন ঊর্মিমালা ডাক্তারী পড়ার জন্য ইউরোপ যাত্রা করেছে। নীরজা যেমন স্বামীর কর্মে সহায়ক হয়েছে ঠিক তেমনই সরলাও বিয়ে না করে বেছে নিয়েছে কর্মজীবনকে। এর আগে রবীন্দ্র উপন্যাসে নারীর সাংসারিক রূপটিই বেশি প্রকট হয়েছিল। বর্তমানে নারীর ভূমিকা আর পুরুষের আড়ালে নয়, প্রত্যক্ষ অবস্থায় হয় সে পুরুষের সহকর্মী নয়তো খুঁজে নিয়েছে স্বতন্ত্র পরিচয়। কারো আশ্রিত ও গলগ্রহ হয়ে থাকতে নারীর আত্মমর্যাদায় বাধছে। পুরুষেরাও নারীর এই মর্যাদার মান দিয়েছে। মালঞ্চে নীরজা যখন মেয়েমানুষের সঙ্গে এত কাজের কথা বলা নিয়ে আপত্তি তোলে তখন আদিত্য পুরুষ হয়েও মেয়েদের কর্মনিষ্ঠার প্রশংসা করেছে। বলেছে 'তোমাকে বিয়ে করবার পর থেকে একটা কথা আবিষ্কার করেছি যে মেয়েরাই কাজের, পুরুষেরা হাড়ে অকেজো। আমরা কাজ করি দায়ে পড়ে, তোমরা কাজ করো প্রাণের উৎসাহে[৯]। আদিত্যের মেসোমশায়ও অনুরূপ বলতেন -'ফুলের বাগানের কাজ মেয়েদেরই, আর গরু দোয়ানো'[১০]।

কলকাতার চালচিত্রে চলমান জীবন ধরা পড়েছে দুইবোন উপন্যাসে শশাঙ্ক, শর্মিলা ও ঊর্মিমালা পুরোপুরিই কলকাতার নাগরিক। মালঞ্চের আদিত্যরাও শহরের বাসিন্দা। তবে শশাঙ্কের ভবানীপুরের বাড়িতে আছে বাগান, টেনিস খোলর লন। চাকরি ছাড়ার পর শশাঙ্ক যখন স্বাধীন কনট্রাকটারী ব্যবসায় অধিক উপার্জন করেছে তখন তার বাড়িতে এসেছে কাপড় কাচার কল, আলুর খোসা ছাড়াবার যন্ত্র। আধুনিককালের কলকাতায় তখন মোটর-এর যুগ শশাঙ্ক বাড়িতে এনেছে মোটর গাড়ি। ঊর্মিকে নিয়ে সে ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ কিমি বেগে গাড়ি ছুটিয়ে কখনো পৌঁচেছে দমদমে এরোপ্লেন ওড়া দেখতে, কখনো বা নিউ মার্কেটে শপিং-এ কখনো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, বটানিক্যাল গার্ডেন কিংবা ডায়মণ্ডহারবারে।

'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ দেশ ও কালকে উপেক্ষা করেননি। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সমাজ মানসিকতা ধরা পড়েছে। তখন ভারতে ইংরেজ শাসনের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে সর্বত্র। মধ্যবিত্ত শ্রেণি তথা ভারতবাসী বুঝে নিয়েছিল এই অত্যাচারের বিচার বিচারালয়ে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই একমাত্র সশস্ত্র প্রতিবাদ বা অহিংস বিপ্লবের দ্বারাই-এর প্রতিকার সম্ভব। দুইবোনে শর্মিল ও শশাঙ্কর নৈনিতালের ট্রেনে রিজার্ভেসন নিয়ে সাহেবের অন্যায়ের বিরুদ্ধে শর্মিলাকে প্রতিবাদী করেছেন। অবশ্য শশাঙ্ক এই অবস্থায় কেঁচো হয়ে ছিল। তার কারণ অবশ্য 'শশাঙ্ক তখনো সরকারি কর্মচারী, উপরওয়ালা জ্ঞাতিগোত্রকে যথোচিত পাশ কাটিয়ে নিরাপদে পথ চলতে সে অভ্যস্ত'[১১]। এছাড়াও শশাঙ্কের অফিসে পদমর্যাদা বৃদ্ধিতে যোগ্যতাকে মানদণ্ড না করে যখন সুপারিশ ও কর্তৃপক্ষের পরিচিতির ভিত্তিতে অযোগ্য সাহেবকে উচ্চমর্যাদা দেওয়া হয় তখন শর্মিলাই বাধ্য করেছে শশাঙ্ককে সেলফ ডিটার্মিনেশন দেখিয়ে চাকরিতে রেজিগনেশন লেটার

লিখতে। এটাও এক ধরনের প্রতিবাদ যা বঙ্গভঙ্গের সময় সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে দেখা গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন– 'কনস্টিটুশনাল অ্যাজিটেশনের পথে গেল না, গেল সেলফ ডিটার্মিনেশানের অভিমুখে। স্বামীকে বললে 'আর নয়, এখনই কাজ ছেড়ে দাও' [১১]। আবার মালঞ্চ উপন্যাসে ত্রিশের দশকে বাংলা উত্তাল বিপ্লবকে দেখাতে সৃষ্টি করেছেন রমেন চরিত্রটিকে। স্বদেশী রমেনকে 'গোরার বাঁশি ঘরে টিকতে দিল না'। রমেনকে তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিদ্রোহী আর্নাকিষ্ট করেছেন। ত্রিশের উত্তাল বিপ্লবে তাকে সামিল করিয়ে বন্দী করে দ্বীপান্তরী করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উত্তর মানুষ তার নিজের প্রতি আস্থা-বিশ্বাস সমস্ত কিছুই হারিয়েছিল। মানুষের মানসিক দৃঢ়তার অবনতি তাকে গুরুর কাছে স্মরণাপন্ন করেছিল। গুরুরা নৈতিক স্থিরতা প্রদান করে মানুষদের সঠিক পথ নির্দেশ করতেন এর সুযোগ নিত কিছু ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ীরা, যারা স্মরণাপন্নের কাছ থেকে মার্গদর্শন-এর অজুহাতে টাকা লুটতো। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মানুষের এই অসহায় অবস্থা লুকিয়ে থাকেনি, তাই রমেনকে নিয়ে এই অবস্থার প্রতি বিদ্রোহজ্ঞাপন করেছেন।

'মালঞ্চ' উপন্যাসের মূল বিষয় তৃতীয় ব্যক্তির আগমনে দাম্পত্য সম্পর্কে টানাপোড়েন। এই ঝড়ের কেন্দ্রে যে ব্যক্তি রয়েছে সে হল সরলা। তবে এই ঝড় কেন্দ্র থেকে ওঠেনি, ঝড় উঠেছে অন্যত্র। কথায় বলে না অলস শরীর রোগের বাসা। নীরজা যতদিন কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল ততদিন সমস্যাই ছিল না। যেদিন থেকে নীরজা কর্মক্ষম হয়ে শয্যাশায়ী নানা দুশ্চিন্তা তাকে ঘিরে ধরেছে। আদিত্যের ব্যাবসায়িক প্রয়োজনে সরলার আগমন ঘটেছে। সরলার উপর আদিত্য মালঞ্চের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছে, যাতে বিগত দশ বছরে নীরজার অধিকার ছিল। বর্তমানে নীরজার চোখের সামনে আদিত্য ও সরলার পাশাপাশি কাজ করেছে, যা সুস্থ অবস্থায় নীরজাই করতো। মালঞ্চের অধিকার চ্যুতি ও ক্রমশ স্বামীর সঙ্গহারার বেদনায় সে অস্থির হয়ে উঠেছে। তেরোছে এভাবেই শুধু বাগানই নয় সরলা স্বামীকেও তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে-সমস্যার সূত্রপাত এখান থেকেই। নীরজার হৃদয়ে ব্যথাভরা কাতরোক্তি আদিত্যের কাছে—'যবে থেকে তোমার রইল বিশ্বের আর ---সমস্ত কিছু আর আমার রইল কেবল এই ঘরের কোন। আমার এই ভাঙা প্রাণ নিয়ে দাঁড়াব কিসের জোরে তোমার ওই আশ্চর্য সরলার সামনে? আমার সে শক্তি আজ কোথায় যে তোমার সেবা করি, তোমার বাগানের কাজ করি?'[১৩]। 'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ' উপন্যাসের কাহিনী মোটামুটি একই, তবে রবীন্দ্রনাথ 'দুইবোন'-এর শর্মিলার আদলে 'মালঞ্চ'-এর নীরজাকে পড়েও তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলেন ঈর্ষাকে। আর নীরজা হয়ে পড়ল প্রতিহিংসাপরায়ণ নারীতে। স্বামী ও বাগানকে নিয়ে তার অত্যন্ত পজেসিভ মনোভাব, শারীরিক অক্ষমতা, হলা মালীর মত স্বার্থান্বেষী মানুষের প্ররোচনায় তার মনে ঈর্ষার বীজ বপিত হল।

নীরজার স্বামী আদিত্য ঈর্ষার অতর্কিত ধাক্কায় আবিষ্কার করেছে যে তার বাল্য-সঙ্গিনী ও কর্ম সহযোগিনী সরলাকে সে ভালোবাসে। আদিত্য বলেছে—

'ভালোবাসি তোমাকে একথা আজ এত সহজ করে সত্য করে বলতে পারছি, এতে আমার বুক ভরে উঠেছে। তেইশ বছর যা ছিল কুঁড়িতে, আজ দৈবের কৃপায় তা ফুটে উঠেছে। আমি বলছি, তাকে চাপা দিতে গেলে সে হবে ভীরুতা, সে হবে অধর্ম'[১৪]। সরলার কাছেও ছেলেবেলার তলিয়ে থাকা ভালোবাসা নাড়া খেয়ে ভেসে উঠেছে উপরে—'এতদিন দৃষ্টি পড়েনি নিজের উপর, বউদিদির বিরাগের আগুনের আভায় দেখতে পেলেম নিজেকে, ধরা পড়লুম নিজের কাছে'[১৫]। নীরজার অসুস্থতার সময় সরলা যখন আদিত্যের ডাকে কর্মে সহায়তা করার জন্য এসেছিল তখন সে পূর্বের সহজ সরল সম্পর্ক ও পূর্বের বয়স নিয়েই কর্মে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু সমাজ এই স্বাভাবিক সম্পর্কের পেছনে তলিয়ে দেখতে চায়, খুঁজে পেতে চায় গোপনীয়তাকে। আদিত্যের মুখে এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনি---'এখনকার সভ্যতাটা দুঃশাসনের মত হৃদয়ের বস্ত্রহরণ করতে চায়। অনুভব করার পূর্বে সেয়ানা করে তোলে চোখে আঙুল দিয়ে। গন্ধের ইশারা ওর পক্ষে বেশি সুক্ষ্ম, খবর নেয় পাপড়ি ছিঁড়ে'[১৬]। সমরেশ মজুমদার তাঁর 'বাংলা উপন্যাসে পঁচিশ বছর' গ্রন্থে বলেছেন-'অতৃপ্তি একবার গোচরীভূত হলে ক্রমাগত তার আকাঙ্খা বেড়ে যায়'[১৭]। একথা ঠিক যে অন্তর্লোকের অপূর্ণতা কামনার অগ্নিকে উসকিয়ে দিলে মনের আড়ালে গোপন মনটি খোঁচা খেয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ে তখনই ট্রাজেডির সূত্রপাত হয়। সরলার ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটাই ঘটেছে-'এর আগে একত্রে ছিলেম যখন, তখন আমাদের বয়স ছিল সে বয়সটা নিয়েই যেন ফিরলুম, সেই সম্বন্ধ নিয়ে। এমনি করেই চিরদিন চলে যেতে পারত। .. হঠাৎ আমাকে ধাক্কা মেরে কেন জানিয়ে দিলে যে আমার বয়স হয়েছে'[১৮]। সরলা এতদিন নীরব কর্মনিষ্ঠা ও অক্ষুণ্ণ আত্মসংযমের অন্তরালে তার অন্তরে আদিত্যের প্রতি ভালবাসাকে অনিচ্ছাকৃতভাবে পোষণ করে এসেছে, তার এতদিন অবিবাহিত থাকার রহস্য বোধহয় এটাই। তাই নীরজার ঈর্ষা এই অস্বীকৃত প্রেমকে সচেতন করে তুলতে সে চরম আত্মসংযমের পরিচয় দিয়ে কারাবরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর মতে—'সরলার আত্মসংযম কিন্তু বৈরাগ্যপ্রিয়তার চরম রিক্ততায় পৌঁছায় নাই; যখন সে বুঝিয়াছে যে, এ প্রেম উভয়ের জীবনের সার্থকতার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় তখন সে ইহাকে প্রত্যাখ্যান করে নাই। তাহার কারাবরণ আত্মবলিদান বা সুলভ ভাবোচ্ছ্বাস নহে, ইহা একদিকে আত্মপরীক্ষার অবসর সৃষ্টি, অন্যদিকে আদিত্যকে মরণোন্মুখ পত্নীর প্রতি অধিকৃত চিত্তে শেষ কর্তব্য পালন করিবার জন্য সুযোগ প্রদান'[১৯]।

শুধু বাগানের অধিকার হারানো নয়, আদিত্যের সাহচর্য হারানোর যন্ত্রণাও নীরজাকে মনোবিকারগ্রস্ত করে তুলেছিল। নীরজার সন্দেহবাদী মন কথায় কথায় রোশনীবাঈ ও হলা মালীকে জিজ্ঞেস করে খবর নিত আদিত্য ও সরলার—'আচ্ছা, ওরা কি বাগানে বেড়ায় জ্যোৎস্না রাত্রে?'[২০]। হলা মালীও নীরজার অন্তরের এই দীনতা লক্ষ্য করে সরলার বিপক্ষে কথা বলে নীরজাকে ঠকাতো। সরলার প্রতি দিনের পর

দিন নীরজার মন বিষিয়ে দেওয়ার জন্য হলামালী কম দায়ী নয়। যদিও শ্রী কুমার বাবু রবীন্দ্রনাথের হলামালীকে নিয়ে ক্ষুদ্র উপন্যাসে একটা প্রসার বৃত্তি হিসেবেই দেখেছেন। ধীরে ধীরে নীরজার কাছে ফুলের বাগানটা সরলার সঙ্গে তার 'প্রেম বিষয়ক প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুদ্ধক্ষেত্র' হয়ে উঠেছিল। বাগানে কোন কাজে সরলার ভুল দেখতে পেলে তা নিয়ে সে সবার সামনে সরলাকে অপদস্থ করতো—এতেই তার আনন্দ, নিজেকে আদিত্যের কাছে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার চেষ্টা। ডাক্তার যখন শেষ সময় বলে গেল তখনো সে বাগানে নিজের ছাপ ফেলে যেতে চায়। হলামালীকে দিয়ে মনের মতো করে গড়ে ফেলতে চায় মালঞ্চটিকে, সেটা স্মৃতি হয়ে থাকবে আদিত্য ও তার সহকর্মের। তাই নীরজা শেষ পর্যন্ত বাগানকে কারো হাতে দিয়ে যেতে পারেনি। নীরজার মুখে তার সুর ধ্বনিত হয়েছে—'তোমাকে মনে রাখতেই হবে যে, এ আমার বাগান, আমারই বাগান, আমার স্বত্ব কিছুতেই যাবে না'[২২]। উপন্যাসের শেষের দিকে মৃত্যুপথযাত্রী নীরজা মালঞ্চের অধিকার সরলার হাতে তুলে দিতে গিয়েও অধিকার হারানোর তীব্র মর্মদাহী যন্ত্রণায় হিংস্র মনোবিকারগ্রস্ত হয়ে উঠে বলেছে—'পারলুম না, পারলুম না-দিতে পারব না, পারব না। জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না! আমি থাকব, থাকব!"। অথচ শেষ রক্ষা হল না, এভাবেই দশ বছরের দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতার নিদারুণ হৃদয়জ্বালা নিয়ে নীরজাকে চলে যেতে হল। উপন্যাসের শেষাংশ যেন ছোটগল্পের সমাপ্তির ইঙ্গিত দিয়ে গেল। আদিত্য ও সরলার মাঝখানে মধ্যবর্তিনী নীরজা থেকেই গেল। তাই উপন্যাসের শেষাংশ মনস্তত্ত্ব ও বাস্তবতার বিচারে সার্থক সমাপ্তি। যদিও শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে '...উপন্যাসটির উৎকর্ষের প্রধান কারণ ইহার মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ নহে, ইহার ভাবগত সুষমা ও সামঞ্জস্য ; এবং নীরজার অন্তিম মুহূর্তের ব্যবহারে এই ঐক্যের হানি হইয়াছে। উপন্যাসটি পটভূমি পুষ্পদ্যান হইতে রুক্ষ-কর্কশ, পুষ্প-সৌরভহীন বাস্তবজগতে স্থানান্তরিত হইয়াছে'[২৩]।

নীরজা যখন মানসিক অস্থিরতায় আচ্ছন্ন তখন তাকে মানসিক দৃঢ়তা প্রদান করতো রমেনের বক্তব্যগুলি। নীরজা রমেনকে নিজের গুরু বলে ঘোষণা করে স্থিরচিত্ত হওয়ার চেষ্টা করেছে। এই কারণেই শ্রীকুমারবাবু তাকে 'সকলের friend, philosopher ও guide' বলেছেন। নীরজা থেকে সরলা একমাত্র রমেনের কাছেই সকলে নিজেকে ব্যক্তকরতো। তাই রমেনই ছিল একমাত্র মধ্যস্থতাকারী সমস্যা সমাধানের। এই হেতু রমেন নীরজাকে বলেছে—'যতক্ষণ মনে করবে তোমার ধন কেউ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ বুকের পাঁজর জ্বলবে আগুনে। পাবে না শান্তি। কিন্তু স্থির হয়ে বসে বলো দেখি একবার, 'দিলেম আমি। সকলের চেয়ে যা দুর্মূল্য তাই দিলেম তাঁকে, যাঁকে সকলের চেয়ে ভালোবাসি'। তা হলে সব ভার যাবে এক মুহূর্তে নেমে। মন ভরে উঠবে আনন্দে'[২৪]। কিন্তু স্বদেশী কার্যকলাপের জন্য রমেনের দ্বীপান্তরে কারাবাস হলে তার অনুপস্থিতিতে নীরজা হয়ে উঠেছে অস্বাভাবিক, হারিয়ে ফেলেছে স্বার্থ

ত্যাগের মন্ত্র।

'দুইবোন' উপন্যাসে শর্মিলা, 'মালঞ্চ'র নীরজার মতো ঈর্ষাপরায়ণ নয়। শর্মিলা তার মাতৃত্বের আসন সবসময় ধরেরেখেছে। শশাঙ্কর সঙ্গে বিবাহের পর থেকেই তার সেবা যত্নের আধিক্যে শশাঙ্ক বিব্রত হয়েছে। তবে একথাও ঠিক যে শর্মিলা নামক রক্ষা কবচে শশাঙ্কর পৌরুষ সত্তা আহত হলেও সে সর্বদা সুরক্ষিতই ছিল। বিপদ তখনই প্রবেশ করেছে যখন থেকে শশাঙ্ক স্বাধীনভাবে কন্ট্রাকটারীতে পৌরুষের প্রকাশ ঘটিয়ে শর্মিলার নিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল ডিঙিয়েছে। শর্মিলা তার স্বামীর দ্বিচারী স্বভাবেও আতঙ্কিত নয়। স্বামী উর্মির প্রতি আসক্ত জেনেও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেনি। তার কারণ এটা হতে পারে যে উর্মি তার নিজের বোন, তাই তার ক্ষতি করার কথা সে ভাবতে পারে না। তবে উর্মি ছাড়াও অন্য কারো ক্ষতি করা শর্মিলার মতো মেয়ের পক্ষে অসম্ভব। কারণ শর্মিলা মা জাতের 'মা হলেন বর্ষাঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব'[২৫]। তাই শর্মিলার অসুখ যখন বাড়াবাড়ি পর্যায় পৌঁছায় তখন সরল হৃদয়ে সে স্বামীকে বলছে—'উর্মিকে দিয়ে গেলুম তোমার হাতে। সে আমার আপন বোন। তার মধ্যে আমাকেই পাবে, আরো অনেক বেশি পাবে যা আমার মধ্যে পাওনি। না, চুপ করো, কিছু বোলো না। মরবার কালেই আমার সৌভাগ্য পূর্ণ হল, তোমাকে সুখী করতে পারলুম'[২৬]। আবার অবিশ্বাস্যভাবে শর্মিলা মরণের দ্বার থেকে বেঁচে ফিরে এলেও সে বোনকে সতীন হিসেবে মেনে নিতেও কুণ্ঠিত নয়। তবে দুই স্ত্রী হলে স্বামীর অসম্মনের কথা ভেবে দূরে আসাম চলে যেতে চেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঊর্মি, শশাঙ্ক-শর্মিলার দাম্পত্য সম্পর্ককে অটুট রেখে বিদেশ যাত্রা করেছে ডাক্তারী পড়তে। এভাবেই উপন্যাসিক 'দুইবোন' উপন্যাস জটিল সম্পর্কের গিঁট ছাড়িয়েছেন।

'দুইবোন' উপন্যাসে শশাঙ্ক-এর কর্মগণ্ডির বাইরে শর্মিলা যত্নশীল হলেও, শশাঙ্ক বিব্রত হয়নি। সে কর্মে খুঁজে পেয়েছে মুক্তির আস্বাদ। আর এই স্বাধীনতার রন্ধ্রপথেই প্রবেশ করেছে ঊর্মি নামক কালবৈশাখী। শ্রীকুমার বাবু এই ঊর্মি চরিত্রের মধ্যে ছেলেমানুষী সত্ত্বার প্রকাশ দেখেছেন। তার শশাঙ্ককে ছেড়ে বিলাত গমনে শশাঙ্কর প্রতি কোনরূপ টানের আভাস মেলে না। যদিও শশাঙ্কের কাছে ঊর্মির প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু, তাঁর মতে—'...পুরুষ তার প্রণয়িনীর কাছ থেকে শুধু সেবা যত্ন চায় না, সর্বোপরি চায় হ্লাদিনী শক্তি। সেদিক থেকে সে তৃপ্ত করতে পারেনি বলেই ঊর্মি তার স্বামীর কাছে প্রয়োজন হয়ে উঠল'[২৭]।

'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ' দুটি উপন্যাসই একগোত্রীয়, তবে পরস্পরের মেজাজ আলাদা। উভয় ক্ষেত্রে সাদৃশ্য যেমন অধিক বৈসাদৃশ্যও কম নয়। দুইবোন উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ হালকা লঘু হাস্য-পরিহাসের মধ্যে দিয়ে লেখা কিন্তু মালঞ্চ অপেক্ষাকৃত গম্ভীর। দুই উপন্যাসে দোল পূর্ণিমার বর্ণনাতে এর পরিচয় পাওয়া যায়। 'দুইবোন'-এ

দোল পূর্ণিমার দিন ঊর্মি ও শশাঙ্ক যখন সারা দিন ধরে রঙ খেলায় মত্ত সেখানে 'মালঞ্চ'-এ সরলার গাম্ভীর্য ও অনাসক্তি দিনটিকে উচ্ছ্বাসময় করে তোলেনি। সরলার স্নিগ্ধতা বা ধৈর্য হয়তো অসুস্থ নীরজার কথা ভেবেই, তবে একথাও ঠিক যে সরলা ঊর্মির মত প্রগলভ তা নয়। উপন্যাসে কখনোই তার চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়নি। দুইবোনে নীরদ চরিত্রটি উপহাসাস্পদ, তার অসংলগ্ন ব্যবহার, আদর্শের ভান চরিত্রটিকে হেয় করেছে। সমাজ জীবনের পর্যবেক্ষক রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে নীরদের মত স্বার্থ সন্ধানী ব্যক্তিরাও বাদ যায় না।

তথ্যসূত্র

১. বিশ্বজীবন মজুমদার। রবীন্দ্র উপন্যাসে দেশ ও কাল। পপুলার লাইব্রেরী। কলকাতা। ১৬ই জুন ১৯৮১। পৃ-২০৩।
২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর। দেজ পাবলিশিং। কলকাতা। ১৯৬১। পৃ- ১১২।
৩. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর। পৃ- ১২১।
৪. সমরেশ মজুমদার। বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। ২১ নভেম্বর ১৯৮৬। পৃ- ১৭।
৫. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর। পৃ-১২৮।
৬. তদেব। পৃ-১২১।
৭. বিশ্বজীবন মজুমদার। রবীন্দ্র উপন্যাসে দেশ ও কাল। পপুলার লাইব্রেরী। কলকাতা। ১৬ই জুন ১৯৮১। পৃ-২০৫।
৮. তদেব। পৃ-২০৫।
৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মালঞ্চ। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। কলকাতা। চৈত্র ১৩৪০। পৃ-৩৬।
১০. তদেব। পৃ-৪০।
১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দুইবোন। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা। ফাল্গুন ১৩৩৯। পৃ-১১।
১২. তদেব। পৃ-১৩।
১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মালঞ্চ। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। কলকাতা। চৈত্র ১৩৪০। পৃ-৪৫।
১৪. তদেব। পৃ- ৫৯।
১৫. তদেব। পৃ- ৫৪।
১৬. তদেব। পৃ-৪২
১৭. সমরেশ মজুমদার। বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। কলাকাতা। ২১ নভেম্বর ১৯৮৬। পৃ-১৭।

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মালঞ্চ। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। কলকাতা। চৈত্র ১৩৪০। পৃ-৫৪।
১৯. শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ। পৃ-১০৭।
২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মালঞ্চ। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। কলকাতা। চৈত্র ১৩৪০। পৃ-৩১।
২১. তদেব। পৃ-৮৯।
২২. তদেব। পৃ- ৯৫-৯৬।
২৩. শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইবেট লিমিটেড। কলকাতা। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ। পৃ-১০৭।
২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মালঞ্চ। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। কলকাতা। চৈত্র ১৩৪০। পৃ-৬৮।
২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দুইবোন। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। কলকাতা। ফাল্গুন ১৩৩৯। পৃ-৭।
২৬. তদেব। পৃ-৯৬-৯৭।
২৭. বুদ্ধদেব বসু। রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য। পৃ-১৬২